চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

অভিজিৎ রায়ের সাথে লেখা 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। আমার ছোটভাই আহমেদ রেদওয়ান জান্না তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ইন্টারনেট, মোবাইল, কম্পিউটারবিহীন ওর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল 'আউট বই'। কিন্তু সে বয়সের জন্য অবিশ্বাসের দর্শন একটু বেশিই 'আউট' হয়ে যায়, তাই আমি তখন পড়ে দেখার জন্য জোর করি নি। ধর্মান্ধদের মতো আগ বাড়িয়ে ওকে নির্ধর্ম নিয়ে কখনও প্রেরণা দিতে ইচ্ছা করত না, কাউকেই করে না। তবে ও যেন যৌক্তিক চিন্তা করতে শেখে, সত্য মিথ্যা নির্ধারণ শিখতে পারে সে চেষ্টা করতাম সবসময়। উপযুক্ত বয়স হলে ও নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, কোনো প্রশ্ন আসলে উত্তর দিতে আমি তো আছি। বইটা প্রকাশিত হবার পর জান্না না পড়লেও অসম্ভব খুশি হয়েছিল তার বড় ভাই বই লিখেছে বলে, পরিবারের একমাত্র সদস্য যাকে আমি আমার লেখালেখির কথা বলতাম। প্রথম বই প্রকাশের আনন্দটা পরিবারের এই একজনের সাথেই তখন ভাগাভাগি করতে পেরেছিলাম।

দেখতে দেখতে দিন চলে যেতে থাকলো। অবিশ্বাসের দর্শনের সাথে সাথে জান্নাও বড় হতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সেরে রাতে বাসায় ফিরে প্রায়ই একটু সময়ের জন্য শুয়ে থাকতাম জান্না'র বিছানায়। ও পাশের টেবিলে পড়ত। ২০১৪ সালের ত্রিশ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল থেকে ঘোষিত হয় যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির রায়। এর বিরোধীতা করে যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াত ইসলামী হরতাল ডাকে, যে কারণে স্কুলে যেতে পারে নি ও। জান্না তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং মাত্রই স্কুলের মান যাচাই পরীক্ষার তত্ত্বীয় অংশ শেষ করেছিল। যেদিন স্কুলে যেতে পারে নি, সেদিন ওর পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষা ছিল। হরতাল হলে অঘোষিত নিয়ম পরীক্ষা বাতিল। কিন্তু সেদিন হয় নি। রাতে বাসায় অভিযোগ আসলো, ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় জান্নাকে হুমকি দেওয়া হলো তাকে মূল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে। জান্না খুব মন খারাপ করেছিল এবং ধরে নিয়েছিল ও পরিবারকে 'অসম্মান' করেছে এবং আর কখনও অসম্মান না করার উপায়ও সে বের করে ফেলে সেরাতে আত্মহত্যা করে। পরদিন সকালে দরজা ভেঙ্গে যখন ওর ঘর ঢুকি, যে ঘরটায় একসময় এক বিছানায় ঘুমাতাম আমি আর জান্না, সেই বিছানার উপরে উপরে ঝুলে আছে জান্না। তার পরনে বিবর্তনের ওপর আমার ডিজাইন করা একটা টি-শার্ট, যেটা কয়েকজন মুক্তমনা সদস্য মিলে করেছিলাম; গেঞ্জিতে লেখা ছিল- "বিবর্তন শুধু একটু তত্ত্ব, ঠিক যেমন মহাকর্ষ"!

আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যাবার সাত দিন আগে সে জানতে চেয়েছিল বিগব্যাং থেকে যদি আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা হয়, তাহলে বিগব্যাং এর আগে কী ছিল? বিছানা থেকে উঠে বসে ওকে নিজে যতটুকু জানি ততটুকু ব্যাখ্যা করলাম। তারপর জানালাম 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটায় একটা অধ্যায় আছে "শুরুতে?" নামে, ও পড়ে দেখলে মজা পাবে। এই প্রথম ওকে বইটা পড়ে দেখতে বললাম, ওর সতেরো বছর বয়সে। অদ্ভুত হলেও সত্যি, আমার নিজের কাছে অবিশ্বাসের দর্শনের কোনো কপি ছিল না। প্রথম সংস্করণও না দ্বিতীয়টাও না। বইটা মাঝে দরকার ছিল বলে বন্ধু জামানের কপিটা নিয়ে এসেছিলাম বাসায়। জান্নাকে পড়তে দেবো ভেবে নিজের ঘরে গিয়ে বইয়ের জঙ্গলে খুঁজে দেখলাম, পেলাম না। ওকে গিয়ে বললাম, পাচ্ছি না, পরে দেবো। সে পর আর আসে নি আমার জীবনে।

প্রায় দীর্ঘদিন 'আউট অফ প্রিন্ট' অবিশ্বাসের দর্শন বইটি অভিজিৎ রায়ের উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল জাগৃতি প্রকাশনী থেকে, ২০১৫ সালের বইমেলায়। জানুয়ারির প্রথম দিনে শাহবাগে গিয়ে হাতে পেলাম নতুন ছাপা হওয়া অবিশ্বাসের দর্শন বইটি। জাগৃতির প্রকাশক ফয়সাল আরেফীন দীপন ফোন করে আগের দিনই জানিয়েছিলেন যে, বইটি ছাপা হয়ে অফিসে চলে এসেছে। সত্যি বলতে কি, এই প্রথম আমি নতুন বই হাতে পেয়ে কেঁদে ফেললাম, সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে হারিয়ে আমার জীবন যখন শূন্যতায় ভরা, তখন মনে হচ্ছিল- ইস বাসায় গিয়ে যদি জান্নাকে দেখাতে পারতাম বইটা। আমার মতো আবেগাক্রান্ত হয়েছিলেন অভিজিৎ রায়ও। যে বছরে ঘাতকরা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে আমাদের অভিজিৎ রায়কে সেই বছরের প্রথম দিনটা তিনি শুরু করেছিলেন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের দর্শনের কথা বলে-

নববর্ষের প্রথম দিনেই প্রকাশকের কাছ থেকে একটা আনন্দের সংবাদ পেলাম। অবিশ্বাসের দর্শন বইটির তৃতীয় সংস্করণ আসছে। ছাপা শেষ, প্রচ্ছদও হয়ে গেছে। বিভিন্ন কারণেই ২০১৪ সালটি ছিল এক বিভীষিকাময় বছর। ২০১৫ সালের শুরুটা অন্ততঃ একটা আনন্দের বার্তা দিয়ে শুরু হলো, এটাই বা কম কী!
"মুক্তি আসুক যুক্তির পথ ধরে! জীবন হোক বিশ্বাসের ভাইরাস মুক্ত"।

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।

মায়ের গর্ভ থেকে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অভিজিৎ রায়ের। ১৯৭১ এর উত্তাল মার্চে, তাঁর বাবা অজয় রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র চার বছর আগে লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি এবং পোস্টডক্টরেট গবেষণা শেষ করে অজয় রায় ফিরে আসেন বাংলাদেশে, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশে এসে শিক্ষকতা, গবেষণার পাশাপাশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন প্রিয় দেশকে পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে রক্ষার আন্দোলনে। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পৃথিবীর ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাংলাদেশের উপর। রাত এগারোটায় ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। টেলিফোন, টেলিগ্রাফসহ বাংলাদেশের সকল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঢাকাকে আলাদা করে ফেলা হয় পুরো বাংলাদেশ থেকে। মানুষ হত্যার জন্য একের পর এক সামরিক অভিযান চলতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, ইপিআর এর সদর দফতর থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে। ট্যাঙ্ক, গ্রেনেড, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্বিচারে চলে সাধারণ মানুষ, ছাত্র, নারী, পুলিশ, আধা-সামরিক সদস্যদের উপর আক্রমণ। সেই ভয়ঙ্কর সময়টাতে অজয় রায়, তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী শেফালী রায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়। ক্র্যাক ডাউনের সেই সময়ে তালিকা হাতে অজয় রায়কে হত্যার উদ্দেশ্যে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল। সদর দরজায় নকল তালা লাগিয়ে সেরাতে পাকিস্তানী সেনাসদস্যের বোকা বানিয়ে নিজেকে, পরিবারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন অজয় রায়। ইংল্যান্ডের চাকরি-গবেষণা-নিশ্চিত জীবনকে ঠেলে সরিয়ে যেই মানুষটি বাংলাদেশে ফিরেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন, পরদেশের হায়েনাদের আক্রমণে সপরিবারে বাধ্য হন গৃহত্যাগে। তাঁর স্ত্রীর শেফালী রায়ের গর্ভে তখন বড়ো হচ্ছে বড়ো ছেলে অভিজিৎ রায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা ছেড়ে তখন ঢাকায় আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের বাসায় আশ্রয় নেন অজয় রায়। কারফিউ উঠে যাবার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সপরিবারে ঢাকা ত্যাগ করেন কুমিল্লার সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে। ভারতের আপার আসামে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনে কর্মরত প্রকৌশলী বড়ো ভাইয়ের বাসায় অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে রেখে, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান অজয় রায়। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাকে আপাতত দূরে ঠেলে কাঁধে তুলে নেন অস্ত্র, কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। অজয় রায়ের সেই মুক্তিযোদ্ধা দলটির বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা বর্ণনা হতে থাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া বেতার তরঙ্গে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এম. আর. সিদ্দীকীর পরামর্শে আগরতলা হয়ে মুজিবনগরে চলে আসেন অজয় রায়। সেখানে গিয়ে জড়িত হয়ে পড়েন তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। অবৈতনিক সদস্য হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলে এবং পরবর্তীকালে সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

যুদ্ধের সেই উত্তাল সময় সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ রোববার সকাল ১২:৪২ মিনিটে শিবসাগর জেলার নাজিরাতে একটি মাতৃসেবা হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন অভিজিৎ রায়। রণাঙ্গনে থাকা বাবা অজয় রায় এক স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জানতে পারেন তার প্রথম পুত্র সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের খবর। চাইলেই তখন ছেলের কাছে চলে যাওয়ার উপায় ছিল না তার, ছেলেকে কোলে তুলে নেবার সৌভাগ্য হয় অভিজিৎ রায়ের চৌদ্দ দিন বয়সে। তারপর আবার ফিরে গিয়েছিলেন রণাঙ্গনে। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলে, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে সদ্য ভূমিষ্ঠ অভিজিৎ রায়কে নিয়ে ত্রিশ লক্ষ মানুষের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন অজয় রায়। যোগ দেন কর্মস্থলে। ফিরে আসেন ফুলার রোডের বাসায়।

শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালের ছোট এক বাড়িতে বেড়ে উঠতে থাকেন অভিজিৎ রায়। ছোট বেলার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অভিজিৎ রায় লিখেছিলেন-

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক ছোট্ট বাড়ির নোনাধরা দেয়াল আর স্যাঁতস্যাঁতে ছাদের নীচে থেকে সেটাকেই আমরা দু-ভাই তাজমহল ভেবেছি। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ছিল উদয়ন স্কুল। সেখানে পড়তে গেছি পায়ে হেঁটে। দূরে কোথাও যেতে হলে রিক্সাই ছিল অবলম্বন। বাড়ির পাশেই বিরাট মাঠে ফুটবল ক্রিকেট খেলে কাটিয়েছি। বাবার কাছে বায়না ছিল ভালো একটা ক্রিকেট ব্যাট। আমার মনে আছে, প্রথম যখন একটা ভালো ক্রিকেট

ব্যাট বাবা নিউমার্কেট থেকে কিনে দিয়েছিলেন, আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। পরে শুনেছিলাম বাবাও নাকি ছাত্রজীবনে ক্রিকেট খেলতেন। বাবা আমাকে 'রাজপুত্রে'র মতো বড়ো করতে পারেননি বটে, কিন্তু বাবাই আমাকে যত রাজ্যের বইয়ের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের শেলফে হাজারো বইয়ের পাশাপাশি ছিল মুক্তধারার কিশোর–বিজ্ঞানের মজার মজার সমস্ত বই। জাফর ইকবালের 'মহাকাশে মহাত্রাস' কিংবা স্বপন কুমার গায়েনের 'স্বাতীর কীর্তি' কিংবা 'বার্ণাডের তারা' এগুলো তাঁর কল্যাণেই পড়া। বাবাই আমাকে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুকুমার রায়ের রচনা সমগ্র। হযবরল-এর বিড়াল, পাগলা দাশু আর হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রির কথা জেনেছি তার কাছ থেকেই। বাবাই আমার মনে বপন করেছিলেন মুক্তবুদ্ধি আর সংশয়ের প্রথম বীজ। বাবাই আমাকে আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন রবিঠাকুরের 'প্রশ্ন' কবিতা।

মুক্তিযুদ্ধ করে বিদেশী হায়েনাদের কাছ থেকে প্রিয় বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছিল ঠিকই, যদিও আমাদের অনেকের মনে-প্রাণে লালিত পাকিস্তানি ভাইরাস ঠিকই রয়ে গেলো। সকল মুসলমান ভাই ভাই, এই বালখিল্য ফালতু কথার অসাড়তা আমরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন টের পেয়েছিলাম। আমরা ধর্মীয় সকল কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে একটি বৃহৎ মুসলমান রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত করে বের হয়ে এসেছিলাম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম মোল্লাদের বিপক্ষে, মেয়েদের গনিমতের মাল আখ্যা দিয়ে আল্লাহর আইন দিয়ে জাস্টিফায়েড করা ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই গৌরব কি আমরা ধরে রাখতে পেরেছি? পারি নি। ফেব্রুয়ারি, যে মাসটাকে আমি ভাবতাম ঢাকা শহরের সবচেয়ে প্রাণময় মাস, ২০১৫ সালের সেই মাসটির ছাব্বিশ তারিখ রাতে ইসলামিক সেক্যুলার বাংলাদেশে চাপাতি দিয়ে হামলা করে মেরে ফেলা হয় বাংলাভাষী মুক্তচিন্তকদের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা, বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায়কে। অভিজিৎ রায় ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, নাস্তিক। তিনি ভালোবেসেছিলেন বিজ্ঞান, ভালোবেসেছিলেন যুক্তি। তিনি লিখেছেন বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, মানবতাবাদ, সাহিত্যসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। শুধু লেখালিখি করেই থেমে থাকেন নি তিনি, একইসাথে বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ভাইরাসের চাপাতির আঘাতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অভিজিৎ রায় বাংলায় লিখেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন দশটি বই। সেরাতে অভিজিৎ রায়ের সাথে থাকা তার স্ত্রী, মুক্তমনা সদস্য ও 'বিবর্তনের পথ ধরে' বইটির লেখক বন্যা আহমেদকেও কুপিয়ে আহত করা হয়, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তার হাতের আঙ্গুল, চাপাতি দিয়ে আঘাত করা হয় তার মাথায় এবং চোখের সামনে ধ্বংস করে দেওয়া হয় তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। অসহায়ের মতো বন্যা আহমেদ হারিয়ে যেতে দেখলেন তার প্রিয়তমকে আর আমরা দেখলাম আমাদের প্রিয় দাদার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা, শুনলাম আমাদের বোনের আর্ত-চিৎকার, আরও দেখলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের কেচিগেট। কেচিগেটের ওপারে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আমার ভাই কিছুক্ষণ আগেই হাঁটছিলেন আমার বোনের হাত ধরে, হাজারো মানুষকে আপন ভেবে তারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে, তখনও হয়ত তার মস্তিষ্কের নিউরনে লেখা হচ্ছিল নতুন কোনো প্রবন্ধ, সমাধান হচ্ছিল মুক্তমনার কারিগরি কোনো সমস্যা। আমার দাদা কিংবা বোন, আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তারা নিজেদের বদলে ভালোবেসেছিলেন তাদের দেশকে, ভালোবেসেছিলেন দেশের মানুষকে, আলোকিত করতে চেয়েছিলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে। কিন্তু আলো অন্ধকারের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, কারণ আলো জ্বালালেই দূর হয় অন্ধকার। আলোকে চাপাতি দিয়ে অন্ধকারকে কোপাতে হয় না, গুলি করতে হয় না, ঘিলু ফেলে দিতে হয় না। অন্ধকারে আলো হাতে পথ চলাই ছিল তাদের অপরাধ, আমাদের ক্ষয়ে যাওয়া সমাজে এই অপরাধ সর্বোচ্চ অপরাধ, এমন অপরাধীদের আমরা পেছন থেকে এসে হত্যা করি। কারণ আমরা অন্ধকার চাই। নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সে রাতে আলো হাতে গিয়েছিলেন আমাদের আঁধারের যাত্রী, কারণ তাকে বলা হয়েছিলো বিজ্ঞান লেখকদের সাথে আড্ডার কথা। যদিও সেখানে বিজ্ঞান লেখকদের সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক বেশি ছিল গুপ্ত ঘাতকেরা। যারা তাকে ডেকে নিয়ে অন্ধকারের হাতে সঁপে দিয়েছিল, তারা সেদিন তার মৃত্যুতে একটুও আলোড়িত হয় নি, ক্ষুধা পেলে আমাদের যেমন খেতে হয়, তাদেরও সেরাতে ক্ষুধা মেটাতে বিরিয়ানি খেতে হয়েছে, কারও বা খেতে হয়েছে মার হাতের রাতের খাবার কিংবা অংশ নিতে হয়েছে পাঁচ তারকা হোটেলের পার্টিতে। সব শেষে তারা শান্তির নিদ্রা দিতে পেরেছে, কারও কারও সেই নিদ্রা ভাঙ্গতে লেগেছে বিশ দিন।

স্বাধীন বাংলাদেশের এক অসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে, টুপি পরে আইডিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে সপ্তম শ্রেণীতে চলে গেলাম খাকি চত্বরের খোঁয়াড় ক্যাডেট কলেজে। কলেজ শেষ করে মুসলমান কোটায় কোনো ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ঢুকে গেলাম ইসলাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউটি) তে। আইইউটি, ওআইসিপরিচালিত বাংলাদেশের অন্যতম 'আন্তর্জাতিক' প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গল্প শুনেছি তারা প্রত্যেক ছাত্রের পেছনে পনেরো হাজার ডলার ব্যয় করে শিক্ষাজীবনের চার বছরের বাজেট হিসেবে। ওআইসির সেই টাকা আমার কপালে জুটে নি, কারণ

মুসলমান হলেও ভালো মুসলিম ছাত্র ছিলাম না, বাবা-মার পকেট থেকে মোটা অংকের টিউশন ফি দিয়েই তাই পড়াশোনা করতে হয়েছে।
আইইউটিতে ভর্তি হবার আগেই জানতাম এখানে কেবলমাত্র 'মানুষ' (শর্ত প্রযোজ্য) দের ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হয়। 'মুসলিম পুরুষ' হওয়াটাই সেখানে মানুষ হবার একমাত্র শর্ত। আইইউটির দুয়ার নারী এবং অমুসলিমদের জন্য বন্ধ। এই চরম সাম্প্রদায়িক আচরণ আমাকে অবাক করলেও- অন্য সবার কাছে শুনেছি- জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবস্থা সারাবিশ্বেই খুব খারাপ, মুসলমানরা নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে নিজেরা পড়াশোনা করে নিজেদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা নাকি খুব ভালো। নারীদের ঢুকতে না দেওয়ার উছিলাটা ছিল- তাতে করে নাকি বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে শুধু পাপাচার হবে। প্রথম বর্ষেই আমাদের তৎকালীন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের প্রধান পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেছিলেন ঠিক এই কথাটাই। রুমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেও তার যুক্তি- ইসলাম ধর্মে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবার পর ভাই আর বোনেরও এক রুমে থাকা নিষিদ্ধ। ইন্টারনেটও ঠিক তেমন একটি প্রাপ্ত বয়স্ক আপন বোন, রুমে তাকে আমাদের সাথে একা রাখা যাবে না।

২০০৭ সাল। দ্বিতীয় বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে দীর্ঘ তিনমাসের ছুটি চলছে। আমার বাসায় থাকতে ভালো লাগত না, তাই ছুটির সময়েও হলে থাকতাম। সপ্তাহান্তে ছোট ভাই জান্নাকে দেখতে খুব ইচ্ছা হতো। ও তখন ক্লাস টু এর পুচকা এবং প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে আমাকে দেখতে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত কারণ আমাকে বললেই আমি চকলেট, আইসক্রিম আর কোক খাওয়াতাম। গাজীপুর থেকে জ্যাম ঠেলে ঢাকা আসতে তিন ঘন্টা সময় লাগে। সেই সময় আমার প্রথম পরিচয় হয় 'অভিজিৎ রায়' এর লেখার সাথে। প্রিয় বন্ধু 'শিক্ষানবিস' আজিজ মার্কেট থেকে দু'টো বই কিনে এনেছিল। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' এবং 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে'। শিক্ষানবিস ময়মনসিংহের এক লাইব্রেরিতে আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইটির সামান্য অংশ পড়ে অভিজিৎ রায়ের লেখনীতে বেশ মুগ্ধ হয়েছিল, তাই আজিজ থেকে "আস্ত" দু'টি বই কিনে আনা। পরের সপ্তাহান্তে জান্নাকে দেখার জন্য 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'কে সঙ্গী করে জ্যাম হাতে বাসযাত্রী হলাম। সেই থেকে শুরু। অভিজিৎ রায়ের আলোয় কাল্পনিক সত্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন।

আমাদের সমাজ সদ্যজন্মজাত শিশুর ইহলৌকিক খেলার মাঠের মৌলিক চাহিদা পূরণে খুব একটা আগ্রহী না হলেও তার পরকাল নিশ্চিত করতে সিদ্ধহস্ত। জন্মগ্রহণ করতে না করতেই সে একটি নির্দিষ্ট ধর্মযুক্ত হয়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে তাকে শেখানো হয় সে যে দলভুক্ত তারাই সেরা, একমাত্র সত্যপথের অনুসারী। অন্যান্যদের জন্য রয়েছে...... (কী রয়েছে সেটা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন)। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ছোটবেলা থেকেই আশেপাশের সবার কাছে আমার ধর্মের মু'জেজা শুনেছি, আর ভেবেছি "ওয়াও!!"। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী ছিল কিনা এখন মনে নেই, থাকলেও তাদের সাথে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কথা হয়নি নিশ্চিত। হলে তখনই জানতে পারতাম, নিজ ধর্মকে অন্যদের চেয়ে সেরা প্রতীয়মান করার জন্য প্রত্যেক ধর্মই নানা ধরনের আকর্ষণীয় মু'জেজা সংবলিত গল্পের আশ্রয় নেয়। এই সহজ সত্যটা বোধহয় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই না জেনে ইন্তেকাল করেন।

আমিও হয়ত সে পথেই যাচ্ছিলাম। ক্যাডেট কলেজে কোনো এক শুক্রবার আমাদের মসজিদের ঈমাম, আবেগঘন ওয়াজ করতে করতে এক গল্প শোনালেন। সে গল্পে ঈশ্বরের অসীম কুদরতে বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির পাতে থাকা ভাজা মাছ হঠাৎ করে অভাজা মাছ হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে থর্পের মতো সাঁতার কেটে হারিয়ে যায় গভীর জলে। সমসাময়িক আর আট-দশটা ছেলের মতই বাংলাদেশি মুসলমান পরিবারে বড়ো হবার ফলে তখনও আমি নিজেকে ধার্মিক ভাবতাম, যদিও পালন করতাম না সেভাবে। ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে পারলে "মা'নত" করেছিলাম সেখানে ছয় বছর এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ দেবো না। সেটা সম্ভব হয় নি। যদিও কোনো ঝামেলায়পড়লে 'আর রহমান' সুরা এগারো বার পড়ে আল্লাহর নিকট ঝামেলা মুক্তির আবেদন করতাম এ আশায় যে এগারো বার সুরা 'আর রহমান'পড়লে যেকোনো ধরনের ঝামেলা থেকে প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা একেবারেই অব্যর্থ। এছাড়া পাশের বাড়ির কোনো মেয়েকে ভালো লাগলেও 'আর রহমান' এবং সুরা 'ইয়াসিনের' আশ্রয় নিতাম, কারণ সুরাগুলো যথাক্রমে এগারোবার ও তিনবার পড়লে, মনোবাসনা পূরণ হতে বাধ্য। কিন্তু ভাজা মাছের জ্যান্ত হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব। মনে মনে ভাবলাম- যদি সত্যিকার অর্থেই এমন ঘটনা কোরান হাদিসে থেকে থাকে, তবুও আমি ভাজা মাছের অভাজা হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করতে পারব না। ধন্যবাদ।

কিন্তু তাতে করে কোনো কিছুই বদলায় না। কোরান মহাসত্য গ্রন্থ এবং আল্লাহ এক এবং তিনি শুধু আমাদের দলে। এমন করে কেটে যেতে থাকা সময়ে একদিন কাঁটাবন মসজিদের লাইব্রেরিতে একটা বই দেখলাম। ইসলাম ও বিজ্ঞান বিষয়ে জনৈক 'আহমদ দীদাত' এর লেখা। সে বইয়ে "মিরাকল নাইন্টিন" নিয়ে একটি অধ্যায় ছিল- যা পড়ে আল্লাহ এবং বিশেষ করে কোরান যে অলৌকিক গ্রন্থ সে ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেলাম। "রাস্তা ঠিকাছে, এখন শুধু ঠিকঠাক ড্রাইভ করে বেহেশতে পৌঁছাতে হবে, তারপরইইইই ..."। তখন বাংলা উইকিপিডিয়াতে সময় পেলেই নতুন নতুন নিবন্ধ তৈরি করি। বইটা পড়ার পর কোরানের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য নিয়ে একটা নিবন্ধ খুলে ফেললাম। এই নিবন্ধই পরবর্তীতে জীবন বদলে দিয়েছিল, কীভাবে, সেটাতেই আসছি।

সচলায়তন ব্লগে অভিজিৎ রায় 'বিজ্ঞানময় কিতাব' নামে এক পোস্ট দিয়েছিলেন ২০০৮ সালের মে মাসে। ধর্মসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই আমার সংশয় ছিল, ছিল সেই সংশয় মনের এক কোণে ফেলে রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টাও। ধর্ম পালন না করলেও সমাজের অন্ধকার শিক্ষায় তখনও মানতাম ইসলাম একমাত্র ধর্ম, মানতাম আল্লাহ বলে আসলেই একজন আছে, মানতাম তিনি বই লিখে সেটা গোপনে একজনের কানেকানে বলে বিশ্বমানবতাকে পথ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অভিজিৎ রায়ের "বিজ্ঞানময় কিতাব" লেখাটা পড়ে সেদিন সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ল। অনুভব করলাম এতোদিন যা জানতাম সব মিথ্যা, যে গ্রন্থকে বিজ্ঞানময় ভাবতাম সেটা মোটেও বিজ্ঞানময় নয়, বিজ্ঞানময়তার উদাহরণগুলো ভক্তদের বানানো মিথ্যা কথা। এভাবে শুধু মিথ্যা বলে একটা গ্রন্থকে এভাবে অলৌকিক করে ফেলা সম্ভব বুঝতে পারলাম। অবশ্য বিজ্ঞানময় কিতাব লেখাতে অভিদা মিরাকল নাইন্টিনের উল্লেখ করেননি। বুঝে গেলাম এটাও মিথ্যা দাবিই হবে। ইন্টারনেটে খুঁজলাম, অভিদার কাছে জানতে চাইলাম এবং দেখলাম আসলেই তাই। সেই থেকে শুরু আমার ধর্ম সংক্রান্ত সংশয়ী চিন্তা। যত গভীরে যেতে থাকলাম, যত পড়তে থাকলাম, তত দেখলাম শৈশব থেকে লালন করা সংস্কারগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। হাজার বছর ধরে চলা ধর্মীয় ভণ্ডামি আর মিথ্যাচারের মুখোশ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকল আমার কাছে। শিক্ষানবিস তখন বিজ্ঞান এবং মাঝে মাঝে ধর্ম- বিজ্ঞান, সংশয়বাদ নিয়ে লিখত। আমি সেগুলো পড়তাম, আর পড়তাম মুক্তমনার বিশাল আর্কাইভ। নিজেও তখন একটু একটু ব্লগিং শুরু করেছি যদিও সেটা নিতান্ত- 'ভাত খেয়ে যাচ্ছি, খেয়ে এসে ঘুমাবো' টাইপের কথাবার্তা। এভাবেই চলছিল দিন। হঠাৎ একদিন মনে হলো, একটা পাপ মোচন করা দরকার। উইকিতে মিরাকল নাইন্টিন নিবন্ধের পাপ মোচন। চিন্তা পর্যন্তই। এরপর হঠাৎ একদিন ক্যাডেট কলেজ ব্লগে মিরাকল নাইন্টিন নিয়ে পোস্ট আসলো। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কোরানের সব কিছুতে আছে মহান উনিশ। আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ একেবারে। আমি গা ঝাড়া দিয়ে বসলাম। মিরাকল নাইন্টিনের ভণ্ডামি তুলে ধরে একটা ব্লগ লিখলাম। এই লেখা যেহেতু আমার পাপমোচন লেখা ছিল তাই এসব বিষয় নিয়ে পুনরায় আর কোনো লেখার আগ্রহ ছিলোনা। কয়েকমাস পরে, অভিদা আমাকে একটা মেইল দিলেন, মেইলের বিষয়বস্তু উনি নেট খুঁজে আমার মিরাকল নাইন্টিন লেখাটা পড়েছেন, আমি যেন মুক্তমনায় নিবন্ধন করে লেখাটা সেখানেও রাখি। আরেকবার মুগ্ধ হবার পালা। কারণ তখন অভিজিৎ রায় এবং বন্যা আহমেদের লেখা বই পড়ে, মুক্তমনার লেখা পড়ে তাদের চিনেছি এবং তারা দুইজনেই ছিলেন আমার কাছে বিশাল উচ্চতার একজন মানুষ। সেই অভিদা আমাকে মেইল করেছেন। তারপরই থেকেই মুক্তমনায় নিবন্ধন করে ধীরে ধীরে সেখানে লেখালেখি শুরু করি মূলত বিবর্তন, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে।

২০০৯ এর ডিসেম্বরের দিকে অভিদা আর বন্যাপা ঢাকায় এসেছিলেন। অভিজিৎ রায় আগে থেকেই বলেছিলেন আগমনের খবর। উনারা ঢাকা আসা মাত্রই ছুটে গেলাম বন্ধু শিক্ষানবিস সহ। সুটকেস ভর্তি বই এবং চকলেট নিয়ে এসেছিলেন বন্যাপা আর অভিদা। আমরা নিজেদের বই ভাগাভাগি করে, সে বইয়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আর চকলেট খেতে খেতে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে তরুণদের ভূমিকা এবং করণীয় নামক বিষয় নিয়ে বিশাল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছিলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে অভিদা কোন চিপা থেকে যেন ভিক্টর স্টেংগরের "নিউ এইথিজম" বইটা বের করে শিক্ষানবিসের হাতে দিয়ে বললেন- পড়তে। অনেক কিছু জানা যাবে। শিক্ষানবিসের আগে সে বই আমি পড়া শুরু করলাম। "অনেক কিছু জানার জন্য" না বরঞ্চ বইয়ের শুরুতে INGERSOLL'S VOW নামে ইঙ্গারসল সাহেবের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ পড়ে মুগ্ধ হবার কারণে। অবিশ্বাসের দর্শন নিয়ে তখন আমার অনেক আগ্রহ, যা পাই তাই খাই অবস্থা। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে প্রায় একবছর পর অভিদা চিঠি দিয়ে বললেন- অবিশ্বাসের দর্শন নিয়ে একটা বই আমরা দুইজন মিলে লিখতে পারি কিনা। অভিদার সাথে লেখালেখির সূচনা হলো আমার। ২০১১ সালে শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত হয় 'অবিশ্বাসের দর্শন'। বইটি সম্পাদনা কাকে দিয়ে করানো হবে সেটা ঠিক করতে আমার কিংবা অভিদার এক মুহূর্তও চিন্তা করতে হয় নি। ছিলেন অকালে হারিয়ে ফেলা অনন্ত বিজয় দাশ। 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটি সম্পর্কে অনন্ত দা ফ্ল্যাপে লিখেছিলেন,

'আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে লেখা অবিশ্বাসের দর্শন বইটি বাংলাভাষী ঈশ্বরবিশ্বাসী থেকে শুরু করে সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী কিংবা মানবতাবাদী এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানমনস্ক সবার মনের খোরাক জাগাবে। ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের মাধ্যমে আগামী দিনের জাত-প্রথা-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণিবৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখা মানুষের গণজোয়ারকে এই বই প্রেরণা জোগাবে'।

এলাম আমরা কোথা থেকে, কোথায়ই বা যাচ্ছি আমরা, এই অনন্ত মহাবিশ্বের সূচনা হলো কীভাবে, এর শেষই বা কোথায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি বা চালানোর পেছনে কি আছেন কোনো অপার্থিব সত্তা, তিনি কি আমাদের প্রার্থনা শোনেন- এ প্রশ্নগুলো শতাব্দী-প্রাচীন চিরচেনা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো নতুন নয়। নানা ধরনের উত্তর সমৃদ্ধ বইও বাংলা ভাষায় কম লেখা হয় নি। তবে এ ধরনের অধিকাংশ প্রচলিত বইয়ে যুক্তির চেয়ে স্থান পেয়েছে অন্ধবিশ্বাস, বিজ্ঞানের বদলে স্থান পেয়েছে কূপমন্ডুকতা। অবিশ্বাসের দর্শন বইটিতে চিরায়ত গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে আমরা বরং প্রশ্ন করেছি, পাঠকদেরও অনুরোধ করেছি 'ক্ষতবিক্ষত হতে প্রশ্নের পাথরে'। সেই সাথে নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছিলাম এই অন্তিম প্রশ্নগুলোর রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো। এই চিরচেনা প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানে বিজ্ঞানের অর্জন স্থান পাওয়ায় তা চুয়াডাঙ্গা থেকে সুদূর আইসল্যান্ড প্রবাসী বাংলাভাষী বহু বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের মনে আলোড়ন জাগিয়েছে। বইটি প্রকাশের পর থেকে অসংখ্য মানুষ ফোন, ইমেইল, ব্লগ, ফেসবুক, টুইটারে তাদের মতামত জানিয়েছেন। বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদ এবং যুক্তিবাদ নিয়ে বাংলায় প্রকাশিত যে সমস্ত বই বাজারে আছে, তার মধ্যেও অগ্রগণ্য বই হিসেবে পাঠকেরা অবিশ্বাসের দর্শনকে স্থান দিয়েছেন। ২০১২ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ বিরতি। ২০১৩ সালেই সব কপি শেষ হয়ে গেলো দ্বিতীয় সংস্করণের। ২০১৪ সালে অভিদার সাথে মিলে বইটি আবার ঠিকঠাক করে দেওয়া হলো জাগৃতিকে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য। ফয়সাল আরেফীন দীপন ভাই বইটা নিষ্ঠার সাথে প্রকাশ করেছিলেন, এবং বিশ্বাসের ভাইরাস ও অবিশ্বাসের দর্শন প্রকাশের মাধ্যমে হয়ে গিয়েছিলেন অপরাধী। বিশ্বাসের ভাইরাসে আক্রান্ত মৌলবাদী জঙ্গীরা তাকে হত্যা করেছিল চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে তার অফিসে ঢুকে।

২০০৯ সালে অভিজিৎ দা ঢাকায় এসে 'সমকামিতা' বইটির জন্য বেশ কিছু সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। পরের বছর শুদ্ধস্বর বইটি প্রকাশ করে। সচলায়তনের কল্যাণে টুটুল ভাইয়ের সাথে আমার আগেই পরিচয় ছিল। অভিদাকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম তার বইগুলো প্রকাশে টুটুল ভাইয়ের আগ্রহ দেখে। সমকামিতার পরে অবিশ্বাসের দর্শন (২০১১), বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে লেখা অভিদার 'ভালোবাসা কারে কয়' ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় শুদ্ধস্বর থেকে। সেবার অভিদা ঢাকায় এসেছিলেন লেখক হিসেবে প্রথমবারের মতো বইমেলা পালন করতে, একা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। অভিদা যতদিন ছিলেন, প্রতিদিন দেখা হতো, কথা হতো, বইমেলায় ঘোরাঘুরি, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, রাতের বেলা কার্জন হলের পুকুর পাড়ে বিশ্রাম নেওয়া, বাইকে করে অভিদাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া। মনে আছে ২০১২ সালের বইমেলা থেকে অভিজিৎ দা বন্যাপাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন- বন্যা তুমি বিশ্বাস করবানা কত মানুষ আমাদের লেখা পড়ে, কতো আগ্রহী মানুষ ঘিরে ধরে রেখেছে আমাকে মেলা জুড়ে, তোমাকে মিস করছি, এরপর আমি বইমেলায় আসলে তোমাকে আমার সাথে আসতেই হবে।
২০১৫ এ বন্যাপাকে সাথে নিয়ে আসবেন বলে গিয়েছিলেন অভিদা। আসলেন তিনি। এবার বইমেলায় তার নতুন দু'টো বই, শুদ্ধস্বর থেকে প্রয়াত গণিত অধ্যাপক মীজান রহমানের সাথে যৌথভাবে লেখা 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' এবং অবসর থেকে 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো' প্রকাশিত হলো। এরসাথে যুক্ত হলো, অবিশ্বাসের দর্শনের জাগৃতি সংস্করণ এবং বিশ্বাসের ভাইরাসের দ্বিতীয় সংস্করণ। শূন্য থেকে মহাবিশ্ব বইটার সম্পাদনায় জড়িত ছিলাম। বইয়ের সম্পর্কে মন্তব্য জানাতে বলেছিলেন অভিদা। পাঠিয়েছিলাম তাকে। আরও কয়েকজনের মতামতের সাথে আমার মন্তব্যটাও বইয়ে যুক্ত করেছিলেন তিনি-

মীজান রহমান এবং অভিজিৎ রায় লিখিত 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইটি গণিতের শূন্যের মূর্ছনার ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠককে নিয়ে যাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমানের কালের সেরা বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম ধারনার এক বৈজ্ঞানিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। 'সৃষ্টির সূচনা' ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আগ্রহের বিষয় হলেও দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে আমরা আজ বুঝতে পারছি মহা পরাক্রমশালী কোনো সত্তার হাতে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি' হয়নি।

মহাবিশ্বের ‘উদ্ভব’ ঘটেছে শূন্য থেকে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে। সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে। এই বইটি তাই বাংলাভাষী বিজ্ঞান ও দর্শনে কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য বই।

২০১৪ সালে জাগৃতি প্রকাশনী থেকে বিশ্বাসের ভাইরাস বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মৌলবাদী অপশক্তিরা অভিজিৎ রায়কে রুটিন করে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। প্রতিদিন একজন করে মানুষকে ‘নাস্তিক’ প্রমাণ শেষে তাকে হত্যা করার আহবান জানিয়ে ফারাবী নামক এক বিকৃত মস্তিষ্কের অমানুষ ততদিনে বাংলাদেশের সামাজিক নেটওয়ার্কের পরিচিত মুখ। নিজেকে কখনও নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘হিজবুত তাহরির’, কখনও ‘শিবিরের’ অনুসারী বলে প্রচার করা ফারাবীর ব্লগে আগমন ঘটেছিল মূলত সহব্লগার মেয়েদের বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তার প্রথম পোস্টও ছিল অজানা অচেনা মেয়েদের ‘বিয়ে করার অনুরোধ জানিয়ে’। মূলত বিভিন্ন ভুয়া আইডি খুলে ফেসবুক এবং ব্লগে মেয়েদের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়াই ছিল তার কাজ। ফেসবুকে আপনারা যারা নিয়মিত, তারা খেয়াল করে দেখবেন, বাংলা ভাষায় ফেসবুকে যে সকল নারী বিদ্বেষী, অশ্লীল, যৌন সুড়সুড়ির পাতা রয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এরা ইন্টারনেট থেকে নারীদের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে সেটা তাদের অনুসারীদের সামনে উপস্থাপন করে এবং একই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ে তারা সমান কম্পাঙ্কে পোস্ট করে। কী সেই বিষয়টা? ধর্ম। যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম, তাই এই অশ্লীল পাতাগুলোর কাছেও ধর্ম বলতে কেবল ইসলাম। ফারাবী যেন এই মানুষগুলোরই প্রতিনিধি। যার একমাত্র কাজ ছিল নারীদের উত্যক্ত করা এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে পোস্ট দেওয়া। মৌলবাদীদের চাপাতির আঘাতে নিজ বাসার সামনে খুন হওয়া আহমেদ রাজীব হায়দারের জানাজার ইমামকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে গ্রেফতার হয় ফারাবী। জামিনে বের হয়ে আসার পর থেকে নিজেকে শোধরানো তো দূরের কথা, উল্টো ব্যাপক উদ্যমে সে ইসলাম ধর্মকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস কায়েমের আহবান জানানো শুরু করে। সিলেট থেকে প্রকাশিত ‘যুক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক অনন্ত বিজয় দাশ সিলেটে নিজ বাসার সামনে নিহত হন মান্নান রাহী নামক ফারাবীর এক ঘনিষ্ঠ সহচরের হাতে। এর আগে তিনি ‘ফারাবীর ফাতরামি’ লেখায় এ প্রসঙ্গে বলে গিয়েছিলেন–

এরপর ফারাবী আবির্ভূত হয় ইসলামের খেদমতগার হিসেবে। হেফাজতকারী হিসেবে। আমাদের এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, এরশাদ যদি আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির রক্ষক হয় তবে এই রাজনীতিকে ধর্ষণ করার জন্য বাহির থেকে কোনো শত্রু আসার প্রয়োজন নেই, তেমন ফারাবীর মতো লুইচ্চা যদি হয়ে যায় ইসলামের খেদমতগার, তবে ইসলামের মুখে চুনকালি মাখাতে কোনো ইসলামবিরোধী, ইসলামবিদ্বেষীর প্রয়োজন নাই।

ইমামকে হত্যার হুমকির অভিযোগে ফারাবীকে আটক করা হলেও সে অস্থায়ী জামিনে জেলহাজত থেকে বের হয়ে আরও বেশি উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ফেসবুকের অসংখ্য ভুয়া আইডি নিয়ে। আল্লাহ ও রসুলকে– তার ভাষায়– যারা অপমান করে, তাদের হত্যা করা জায়েজ। এই ফতোয়া দিয়ে সে একের পর এক শুভবুদ্ধির লেখক, ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের হত্যার হুমকি প্রদান শুরু করে।

ফারাবীর ভাষ্যমতে–

ইসলাম অর্থ শান্তি নয়, ইসলাম অর্থ হল আত্মসমর্পণ। ইসলামের ভিতরে জিহাদ, ক্বিতাল সবই আছে। আল্লাহ-রসুলকে যারা ঠাণ্ডা মাথায় গালিগালাজ করবে আমরা তাদেরকে হত্যা করব এতে লুকোচুরির কিছু নাই।

২০১৪ সালে বিশ্বাসের ভাইরাস বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মৌলবাদী অপশক্তিরা অভিজিৎ রায়কে রুটিন করে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। উনি দেশের বাইরে থাকেন বিধায়, তাঁর বই বিক্রির দায়ে বাংলাদেশের অনলাইন বই কেনার সাইট ‘রকমারি ডটকম’-এর অফিসের ঠিকানা প্রদান করে পোস্ট দেয় ফারাবী নামক বিকৃত মস্তিষ্কের অমানুষটি। বাংলাদেশে নাস্তিকতা ছড়ানোর অপরাধে সে তার অনুসারীদের রকমারির অফিস আক্রমণের আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে স্বত্বাধিকারীর প্রোফাইল উল্লেখ করে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর বাংলাদেশের শুভবুদ্ধির সব মানুষকে অবাক করে দিয়ে রকমারির স্বত্বাধিকারী মাহমুদুল হাসান সোহাগ তার স্ট্যাটাসে অভিজিৎ রায়সহ অন্যান্য লেখকদের বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার বই বিক্রি করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তারপরও ফারাবী সন্তুষ্ট না হওয়ায় রকমারি ডটকম তার দেওয়া লিস্ট ধরে নিমেষেই সকল বই তাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার করে বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধরে এই ঘটনার সময় থেকেই আমি রকমারি ডটকমের সংশ্লিষ্টদের

অনুরোধ করি, ফারাবীর ভয়ে ভীত হওয়ার বদলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আমাদের সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে ওরা মৌলবাদী তোষণকেই তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং 'নাস্তিক'দের বই (পড়ুন বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল বই) বিক্রি চিরতরে বন্ধ করে দেয়। অবশ্য বন্ধ করার আগে নিজেদের মেরুদণ্ডহীনতা ঢাকতে তারা জানিয়ে দেয়, ফারাবীর হুমকির আগে থেকেই তারা এ ধরনের বই সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সে উদ্যোগের কারণেই এখন বইগুলো চিরতরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অপকর্মের হোতা ফারাবীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেনি।
মৌলবাদীদের হত্যার পরোয়ানা সত্ত্বেও প্রিয় বাংলাদেশে এসেছিলেন অভিজিৎ রায়। এসেছিলেন অসুস্থ মা কে দেখতে, অসুস্থ বাবাকে দেখতে, বইমেলায় প্রকাশিত নতুন নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতে, বাংলাদেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে। তিনি এসেছিলেন আমাদের অতিথি হয়ে। তিনি জানতেন না, তার প্রিয় বাংলাদেশ বদলে গেছে। ২৩ তারিখ রাতে অভিদাকে মনে করিয়ে দিলাম, হুমকিগুলোকে হালকাভাবে না দেখতে। উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। 'আমি লেখক মানুষ, আমাকে কেনমারবে?'।

ফেব্রুয়ারির ছাব্বিশ তারিখ রাত আটটা তেইশ মিনিটে অভিদার কাছ থেকে শেষ এসএমএসটা আসে আমার ফোনে। 'রায়হান, তুমি কই?'। আমি আর সামিয়া তখন বাসার বাইরে, বইমেলা থেকে অনেক দূরে, বাজার করছি, পরের দিন অভিদা আর বন্যাপা আমাদের বাসায় আসবেন! দেশে আসার পর থেকেই বন্যাপা বলছিলেন, মুক্তমনা ব্লগের যারা দেশে আছে তাদেরকে কোথাও একত্র করতে, তিনি সবাইকে খাওয়াতে চান। আমরা তখন একটা নতুন বাসায় উঠেছি, পাঁচতলার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই আধখানা ছাদ, আর আধখানা বাসা। ইচ্ছে ছিল আমরা আট-দশজন মিলে সারাদিন আড্ডাবাজিতে কাটাব, বন্যাপার সাথে মিলে অভিদাকে পঁচাবো, তারপর অভিদার সাথে মিলে বন্যাপাকে, ক্ষুধা পেলে পেট সাঁটিয়ে অভিদার প্রিয় বিরিয়ানি খাব। ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখে আমি আর সামিয়া প্রথম জানতে পারি আমাদের মাতা-পিতা হবার সম্ভাবনার কথা, আমাদের সোফির আগমনের কথা। খবরটা শুনে আমি সামিয়াকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ এবং আমরা দুইজনেই একই সাথে ঠিক করি, বাবা-মা-ভাই-বোনদের পর পরবর্তী পরিবারের সদস্য হিসেবে জানাব বন্যাপা আর অভিদাকে, ফেব্রুয়ারির সাতাশ তারিখে। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও ছাব্বিশ তারিখের পরের সেই দিনটা আমার জীবনে আর আসে নি। না ঘটা সেই দিনটা নিয়ে আমি আজও ভাবি, চোখের সামনে নানাভাবে চিত্রায়িত হয় দিনটির প্রতিটি ক্ষণ।
ফারাবীতে পরিপূর্ণ এইদেশে আমরা পেয়েছিলাম অভিজিৎ রায়কে, অনন্ত বিজয় দাশ, নীলয় নীল, ফয়সাল আরেফীন দীপন, রাজীব হায়দারকে। তাঁরা আলো ছড়িয়েছেন, চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন মানুষকে। অভিজিতের আলোকে গ্রাস করতে অন্ধকার হামলা করেছিল পেছন থেকে। অভিজিতের সেই আলোর মশাল লক্ষ অভিজিতের তুলে ধরতে দেরি হয় নি। এক অভিজিৎ থেকে বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে লক্ষ অভিজিৎ। অভিজিৎ রায়ের বই প্রকাশের জন্য জীবন দিয়েছেন ফয়সাল আরেফীন দীপন, মৌলবাদীদের চাপাতির আক্রমণে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন শুদ্ধস্বর প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুল। জীবন দিয়েছেন বইটির সম্পাদক 'অনন্ত বিজয় দাশ'। মৌলবাদীরা আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল, মেডিক্যাল প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা বন্ধ রেখে, দেশের জন্য কাজ করা বন্ধ রেখে আমাকে দেশ ছেড়ে হতে হয়েছে 'শরণার্থী'।

আবার আসলো ফেব্রুয়ারি। মহাবিশ্ব সমান শূন্যতা আর বিষাদ নিয়ে। শুদ্ধস্বরের প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুল নিজে থেকে 'অবিশ্বাসের দর্শন' এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বই প্রকাশের যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তাতে আসলেই প্রমানিত হয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধস্বর আসলেই 'মন যোগাতে নয়, মন জাগাতে' কাজ করে শত বাধা-বিপত্তি-প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। বইটির ভেতরের অধ্যায়গুলো অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাশ, ফয়সাল আরেফীন দীপন যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন সেভাবেই রইল। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রকাশকদের মেলা শুরু আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছেন 'উস্কানিমূলক' বই প্রকাশ না করতে। জানি না, উনি অবিশ্বাসের দর্শন, বিশ্বাসের ভাইরাস বইগুলোর কথা বুঝিয়েছেন নাকি বুঝিয়েছেন হিংসা-বিদ্বেষ-হানানাহিতে পরিপূর্ণ ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা। জানি না বলা ঠিক না, আসলে জানি।

ঈঙ্গারসলের সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমি ভুলে যাই নি, ভুলে যাননি অভিজিৎ রায়ও। সেই প্রতিজ্ঞা দিয়েই শেষ হোক, অবিশ্বাসের দর্শনের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা। আমাদের জীবন দীপান্বিত হোক, মুক্ত হোক বিশ্বাসের ভাইরাস থেকে।

যেদিন নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলাম আমার চারপাশের সবকিছুই প্রাকৃতিক, সকল দেবতা, অপদেবতা কিংবা ঈশ্বর মানুষের সৃষ্ট পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীত কিছুই নন, সেদিন সত্যিকারের স্বাধীনতার তীব্র আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল আমার মন, শরীরের প্রতিটি কণা, রক্তবিন্দু, ইন্দ্রিয়। আমাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা চার দেয়াল টুকরো টুকরো হয়ে মিশে গেলো ধুলোয়, আলোর স্রোতে আলোকিত হয়ে গেলো আমার অন্ধকূপের প্রতিটি কোণ। সেদিন থেকে আমি কারও চাকর, সেবক বা বান্দা নই। এই পৃথিবীতে আমার কোনো মনিব নেই, আমার কোনো মনিব নেই এই সীমাহীন মহাবিশ্বেও।

আমি স্বাধীন, মুক্ত– চিন্তা করতে, চিন্তারাজি প্রকাশে, আদর্শ নির্ধারণে, ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গী করে নিজের মতো বাঁচতে। আমি স্বাধীন আমার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা ব্যবহারে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে, নিজের মতো স্বপ্ন দেখতে, আশা করতে। আমি স্বাধীন – নিজের মতো ভাবতে। আমি স্বাধীন– নির্দয়, উগ্র ধর্মকে অস্বীকার করতে। আমি স্বাধীন– অসভ্য, মূর্খের 'অলৌকিক' গ্রন্থসমূহ এবং এগুলোকে পুঁজি করে ঘটা অসংখ্য নিষ্ঠুরতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আমি স্বাধীন অসংখ্য মহাজাগতিক মিথ্যা থেকে, স্বাধীন সীমাহীন শাস্তির ভীতি থেকে, আমি স্বাধীন ডানাওয়ালা ফেরেশতা থেকে, শয়তান থেকে, জ্বিন-ভূত এবং ঈশ্বর থেকে। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি স্বাধীন।

আমার চিন্তার রাজ্যে সেদিন থেকে নেই আর কোনো নিষিদ্ধ জায়গা, নেই কোনো অশরীরী শৃঙ্খল যা বেঁধে রাখে আমার অবয়বকে, আমাকে রক্তাক্ত করার জন্য নেই কোনো অলৌকিক চাবুক, আমার মাংসের জন্য নেই কোনো আগুন। আমার মাঝে নেই ভয়, আমার মাঝে নেই অন্যের দেখানো পথে হাঁটার দায়বদ্ধতা, আমার প্রয়োজন নেই কারও সামনে অবনত হওয়া, কাউকে পূজা করা, আমার প্রয়োজন নেই মিথ্যে কথা বলারও। আমি মুক্ত। ভয়-ভীতি, মেরুদণ্ডহীনতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেদিন আমি প্রথমবারের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, জগতকে নতুন করে দেখার, ভাবার চেতনা নিয়ে।

আমার অন্তর সেদিন কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল। আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলাম ইতিহাসের সেই সব নায়কদের প্রতি, মানুষের প্রতি যারা নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল, বিসর্জন দিয়েছিল মানুষের হাত এবং মস্তিষ্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম পৃথিবীর আলোকিত সকল সন্তানদের, যাদের কেউ আত্মাহুতি দিয়েছিল মূর্খের সাথে যুদ্ধে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল অন্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধাবস্থায়, যাদের মাংস পুড়েছিল ধর্মান্ধদের আগুনে। আলোকিত সেইসব সাহসী মানুষেরা, যারা এসেছিল পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, যাদের চিন্তায়-কর্মে স্বাধীনতা পেয়েছে মানুষের সন্তানেরা। অতঃপর আমি নীচু হলাম, যে আলোর মশাল তারা জ্বালিয়েছিলেন সে আলোর মশাল তুলে নিলাম নিজের হাতে, উঁচু করে তুলে ধরলাম সেটা, এ আলো নিশ্চয়ই একদিন জয় করবে সকল অন্ধকার।

রায়হান আবীর
কানাডা
ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৬